অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজব বাতি

দেবনাথ ডেক ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া সমুদ্রে। টলতে টলতে সে হেঁটে যাচ্ছিল। তার কেন জানি, এ সময় ফের লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হল। ফোকসালে সে ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারত। কিন্তু সবাই যা করছে। বন্ধু, প্রেমা, রাজু সবাই যেন টের পেয়ে গেছে ব্যাটা কিছু লুকাচ্ছে। এমনকি তাকে গোপনে অনুসরণ পর্যন্ত করতে পারে! সে টুইন-ডেকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, না, কেউ এদিকটায় আসছে না। ডেক-টিণ্ডাল তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বোট-ডেকে জল মারছে। তার কাজ গ্যাঙওয়েয়ের পেছনটাতে। হাতে রঙের টব। চিপিং করার হাতুড়ি পকেটে। সে রং করতে যাচ্ছে। সকালে চা-চাপাটি খেয়ে একটা সিগারেট মৌজ করে খেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু ফোকসালে প্রেমা রাজুর উপদ্রবে সে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা পর্যন্ত ধরাতে পারল না। রোজ এক উপদ্রব।

আরে দেখি দেখি! কবে কিনলি?

সঙ্গে সঙ্গে সে লাইটার ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে।

দেখি না! কত দিয়ে কিনলি?

দেবনাথ রা কাড়ে না। তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ি ধরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচে। ওরা ধাওয়া করে। সেও ডেক ধরে দৌড়ায় এবং একসময় জোরজার করে চেপে ধরলে দেবনাথ হাত তুলে দেয়।—দ্যাখ, দ্যাখ না। নেই।

কোথায় রেখেছিস?

ফোকসালে।

আসলে এভাবেই লাইটারটা নিয়ে ওদের চারজনের মধ্যে বেশ একটা রহস্যময়তা গড়ে উঠেছে। লাইটারটা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। পোর্ট অফ সালফার থেকে জাহাজ ছাড়ার পরই ওরা পেছনে লেগেছে। সে কিছুতেই লাইটারটা হাতছাড়া করতে চায় না। ওরাও দেখবেই। ছাড়বে না।

এই দে না, সিগারেট ধরিয়ে নি।

না।

শালা তোমার লাইটারে কী আছে? আমরা খেয়ে ফেলব? তুই কী রে! আমাদের কাপ-ডিশ ধরে দেখিস ব্যাটা, কী করি! প্রেমা, লকারে চাবি দিয়ে রাখবি তো। জাহাজে উঠে এসেছে—নিজের কাপ-ডিশ পর্যন্ত আনেনি! ব্যাটা হাড়কেপ্পন!

দেবনাথ চুপচাপ থাকে। তা সে সামান্য কিপ্টে স্বভাবের। তার মতো মানুষের পক্ষে কোনো শৌখিন জিনিস কেনা সম্ভব রাজু প্রেমা ভাবতেই পারে না। পলকে সিগারেট ধরিয়েই নিভিয়ে দেয়। তখনই ওরা দেখে ফেলে, বস্তুটি সত্যি শৌখিন। আকারে একটু

বড়োকাচের আবরণ, এক পাশে সোনালি জলের দাগ, কিছু সবুজ লতাপাতার চিত্রমালা কাচের গায়ে। এইটুকু দেখেই বুঝেছে, দেবনাথ তবে টাকা খরচ করতে শিখেছে। প্রথম দিকে জাহাজে ওঠে, সে বন্দর এলে নামতই না। নতুন জাহাজিও নয়। এই নিয়ে পাঁচ সফর। সিটি লাইনেই তার পর পর তিন সফর হয়ে গেল। ডারবান, কেপটাউন, স্যান্টিস–কোথাও সে নামেনি। বুনোসাইরিসে এক বিকেলে নেমে সস্তায় কিছু আপেল কিনে এনেছিল— এই যা। তারপর পোর্ট অফ জামাইকাতে মাঝে মাঝে দল বেঁধে নেমে গেছে। কিন্তু কোনো সওদা করেনি।

দেবনাথ পকেট থেকে লাইটার বের করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, না। কেউ অনুসরণ করছে না। মেজ মালোম দু-নম্বর ফল্কায় দাঁড়িয়ে বড়ো মালোমের সঙ্গে কথা বলছেন। জাহাজ যাচ্ছে হাইতি দ্বীপে। সেখান থেকে সোজা বিশ-বাইশ দিনের যাত্রা। রসদ নেবার জন্য জাহাজটা দ্বীপে কয়েক ঘণ্টা থামবে। সাত আট মাস হল ওরা সফরে বের হয়েছে–একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা কাঁহাতক ভালো লাগে।

দেবনাথ জাহাজে উঠলেই বাড়িঘরের কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকে। কিনারায় কাজ পেলে সে কিছুতেই জাহাজে মরতে আসত না—এমন সে কতবার আক্ষেপ করেছে। সেই দেবনাথ বেশ হাসিখুশি। শিস দিয়ে একদিন হিন্দি গানের কলিও ভাঁজছিল দেখে রাজু এমনকি সারেঙ পর্যন্ত অবাক। আরে দেবনাথ শিস দিচ্ছে।

সত্যি শিস দিচ্ছিল দেবনাথ!

লাইটারটা জ্বালাবার আগে দেবনাথ আশ্চর্য এক উত্তেজনা বোধ করে। সে হাত দিয়ে বার বার দেখে পকেট আছে তো—এই এক ভয় নিরন্তর। কেউ না মেরে দেয়। মেরে দিলে নির্ঘাত সে পাগল হয়ে যাবে। সামান্য একটা লাইটারের প্রেমে পড়ে যেতে পারে কেউ, এই প্রথম দেবনাথ টের পেল। সে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে দেখল বারবার নিভে যাচ্ছে। ঝাপটা হাওয়া নিভিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ এবং অসীম অনন্ত আকাশ ছাড়া তাকে দেখবার কেউ নেই। সে আড়ালে-আবডালে কাজ করতে ভালোবাসে। আসলে কেউ জানেই না লাইটারটা জ্বালিয়ে সে অপলক দেখে কিছু। লাইটারের কাচের মধ্যে তার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। কেমন এক ঘোর তৈরি হয়। সে জাহাজের কাজকর্মের ব্যস্ততার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়।

এই যে দেবনাথ! বসে কেন?

না স্যার, মানে...। সে তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে মাস্তুলে রং লাগাতে শুরু করে। ধরা পড়তে পড়তে কতদিন বেঁচে গেছে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ফোকসাল, কিন্তু একদণ্ড খালি থাকে না। যখন-তখন যে-সে ঢুকে যায়।

আরে তুমি লাইটার জ্বালিয়ে কী দেখছ!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে। তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে।

না দেখছিলাম?

কী দেখছিলে?

সে কী দেখছিল বললে জাহাজে মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। বলা যায় না, খুনটুনও।

সে বলে, না, কিছু না।

দেবনাথ সবসময় সতর্ক থাকে। ঘুমাবার আগে লাইটারটা কোথাও লুকিয়ে রাখে। নিজস্ব লকার থাকে না। দুজনের জন্য একটা লকার বরাদ্দ। কাজেই চাবি দিয়ে যে নিশ্চিত থাকবে তার উপায় নেই। লকারের ডুপ্লিকেট চাবি রাজুর কাছে। সে পেলেই ওটা মেরে দেবে। এবং যদি টের পায়, কোনো অলৌকিক ছবি লাইটার জ্বাললে দেখা যায় তবে তো কথাই নেই।

লাইটারটা কেনার পর থেকেই তার বিচিত্র শখ জন্মেছে। সে নীল রঙের টাই পরে সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট গায়ে দিয়ে বোট-ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাজের সময় ছাড়া কোনো জাহাজি এদিকটায় বড়ো আসে না। বোট–ডেকের মাথায় কাপ্তানের কেবিন। ব্রিজে উঠে যাবার সিঁড়ি। পাশে চার্টরুম। বোট-ডেকের পাশে কিছুটা আড়াল আছে। দুটো বোটের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। আফটার-পিক কিংবা ব্রিজ থেকে জায়গাটা দেখা যায় না। কেবল ওয়াচ বদলের সময় ফায়ারম্যানরা উঠতে নামতে দেখতে পায়, দেবনাথ চুপচাপ বোট-ডেকে বসে আছে।

আরে এখানে!

এই এমনি। সে আবার কিছু লুকিয়ে ফেলে।

সে তার বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় সব পাল্টে ফেলেছে। ফোকসাল আর কেবিনের তফাত আকাশপাতাল। ফোকসালে চারটে বাঙ্ক। ম্যাট্রেস। কোম্পানি থেকে দুটো নীল প্যান্ট, নীল শার্ট, একটা গরম কালো রঙের সোয়েটার পায় জাহাজিরা। সেও পেয়েছে। বাড়তি জামা প্যান্ট যতটা দরকার—এই যেমন সে কার্ডিফের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে একটা কোট কিনেছিল প্রথম সফরে শীতের দেশে এখনও সেই কোটই সম্বল। সে আর কিছু কেনাকাটা করেছে বলে কেউ জানে না। কারণ একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় বের হলেই মন খারাপ হয়ে যায়। মা বাবা ভাই বোন ফেলে সমুদ্রে ঘুরতে তার ভালো লাগে না।

বিচিত্র শখ। এজন্য যে, সাদা চাদর সাদা ওয়াড় যেমন কেবিনে ধোপদুরস্ত, ছিমছাম পাতা থাকে সব কিছু, তেমনি তার, বিছানায় সাদা চাদর বালিশের সাদা ওয়াড়—স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এমনকি বন্দরে এলে মেসরুম মেট ফুলও রাখে ফ্লাওয়ার ভাসে-স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তার বাঙ্ক, বিছানা অফিসারদের মতো করে নিয়েছে। সে দামি গন্ধ সাবান মাখে। গায়ে বিদেশি আতর দেয় আজকাল।

স্বাভাবিক কারণেই একজন সামান্য জাহাজির এই ধরনের শৌখিন জীবনযাপন বিচিত্র শখের পর্যায়ে পড়ে। জাহাজিরা অফিসারদের মতো কে কবে শৌখিন হয়!

হাইতিতি দ্বীপ থেকে জাহাজ যাচ্ছে অকল্যান্ডে। এ সময় দরিয়ায় ঝড়-ঝাপটা লেগে থাকে বলে ডেকে বের হওয়া যায় না। বলতে গেলে মাত্র পাঁচ-সাতদিন সমুদ্র শান্ত ছিল। তখন দেখা যেত দেবনাথ একা একা বোট-ডেকের দিকে উঠে যাচ্ছে। ডেক-জাহাজিদের পাঁচটার পর ছুটি। জাহাজের স্টাবোর্ড-সাইডে থাকে ডেক-জাহাজিরা। সুখানিরাও থাকে। তিন সুখানি এক ফোকসালে। পাশের ফোকসালে থাকে ডেক-টিন্ডাল আর ডেক-কর্মীরা।

সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে দুদিকের ফোকসালে থাকে এনজিন-সারেঙ আর ডেক-সারেঙ। স্টারবোর্ড-সাইডের জাহাজিদের রাতে পালা করে দুজনকে অবশ্য ওয়াচ দিতে হয়। ফরোয়ার্ড-পিকে ডিউটি থাকে। অন্ধকারে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে টনটন করে ঘণ্টা বাজাতে হয়।

দেবনাথের আদ্ভুত আগ্রহ রাতে ফরোয়ার্ড-পিকে ওয়াচ দেওয়ার। সাধারণত এই ওয়াচ ডেক-জাহাজিরা পছন্দ করে না। পুরো চার ঘণ্টা একটানা দাঁড়িয়ে দূরের সমুদ্রে লক্ষ রাখা খুবই কঠিন কাজ। এ-কাজে উৎসাহ কেন এত দেবনাথের কেউ বুঝতে পারছে না। যেন সে যদি রোজ এই ওয়াচের কাজটা পায় বর্তে যায়। এটাও রাজু, প্রেমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কোথায় সারাদিন খাটুনির পর পড়ে ঘুমাবে, না তিনি চললেন ফরোয়ার্ড-পিকে ওয়াচ দিতে।

তারা আরও আশ্চর্য হল, অকল্যান্ড বন্দরে তাকে থ্রি-পিস-স্যুট করাতে দেখে। আরে শালা যে জাহাজের সব টাকা খতম করে যাবে বলে ঠিক করেছে। অবশ্য ইচ্ছে করলেই এটা হয় না। জাহাজিরা সমুদ্রের মাইনের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তুলতে পারে। তবে বেশি পারে না। কিন্তু দেবনাথের টাকায় কুলোচ্ছে না বলে সে ফালতু কিছু কাজ স্টুয়ার্ডের করে দেয়। সে হিসাবপত্র রাখতে ওস্তাদ। কিছু টিপসও নিয়েছে স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে। যেমন পানামা থেকে কম্বল কিনে নিতে পারলে বেশি দামে বিক্রি করা যায়। ঘড়ি কিনে নিলেও বেশি দাম পাওয়া যায়। সে রেডিও পর্যন্ত কিনে নিয়েছিল বিক্রি করবে বলে। তবে দাম পায়নি বলে বিক্রি করেনি। সে এখন অবসর পেলেই রেডিওতে বিদেশি সংগীত শুনতে শুনতে কেমন মজে যায়।

একটা সামান্য লাইটার তাকে এমনকি প্রেমে ফেলে দিল বুঝতে পারছে না তারা!

শালা ফুটানি করতে গিয়ে ধনে জনে যাবে এবার। এবং সত্যি সে একদিন রাজুকে বলল, এই, দু-ডলার ধার দিবি।

রাজু বলল, আর কি কেনার থাকল বাবা! তুমি তো ফোকসালে থাক না মনে হয়। কেবিনে থাক, ফুল কিনে আনছ কেন গুচ্ছের! ফুলের ভাস! দরিয়ায় সব শালা উলটে পড়ে ভাঙবে।

দেবনাথ রা কারে না।

এরপর তারা ভাবল, দেখা যাক ব্যাপারটা কী!

জাহাজ আবার সমুদ্রে। যাবে তাসমানিয়ায়। দেবনাথ আবার ওয়াচ দেবার জন্য রাত বারোটায় ফরোয়ার্ড-পিকের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল সব। তারা তিনজনেই জেগে ছিল। কেন এত আগ্রহ। এমন একটা একঘেয়ে কাজের। পালা করে দেবার নিয়ম। ডেক সারেঙকে ভজিয়ে সে এখন একাই রাতের ওয়াচ দেয়।

ওরা ডেকে উঠে দেখল, দেবনাথ কানের কাছে রেডিও নিয়ে শুনছে। থামছে। আবার হাঁটছে। সে গেলে ওয়াচের পরীদার চলে আসবে। সে একটু বেশি আগে যাচ্ছে। রাত এগারোটা না বাজতেই দেখলাম ওয়াচ দিতে যাচ্ছে আচ্ছা লোক মাইরি! পারলে যেন দুটো ওয়াচ তাকে একা দিলে সে আরও বেশি খুশি হতে পারে। লাইটারটা আর তারা

দেখেইনি। ওটাও কি বিক্রি করে দিল! কী জানি কীসে যে মজে যায় কখন মানুষ বোঝা কঠিন। লাইটারটা আর তারা দেখতে পায় না। সে সিগারেট খাওয়াও কি ছেড়ে দিল শেষ পর্যন্ত।

সমুদ্রে জ্যোৎস্নার আলাদা একটা রূপ আছে। অন্ধকারেরও। আকাশে বেশ বড়ো গোল চাঁদ। ঢেউ নেই বলে স্থির দেখাচ্ছে। ঢেউ থাকলে জাহাজ টলত। চাঁদও মাতলামি শুরু করে দিত আকাশে। তবে মজা, জাহাজ যেদিকে যায়, চাঁদও সেদিকে ভেসে চলে। যেন দুই সঙ্গী নির্জন সমুদ্রে এবং এই নীরবতা কখনও মানুষকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে মধ্যরাতে সমুদ্র আরও নিথর। এনজিনের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসে না। মাঝে মাঝে ওয়াটার ককের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায়। নতুন রং হলে রং বার্নিশের গন্ধ। মাস্তুলে আলো জ্বালা থাকে। ডেকে, টুইন ডেকে এবং আফটার-পিকে আলো জ্বালা থাকে। অস্পষ্ট আলো অন্ধকার সারা জাহাজ ডেকে ভেসে বেড়ায়। শুধু ব্রিজে জেগে থাকে সুখানি, সেকেন্ড মেট, এনজিন রুমে ফায়ার ম্যান, টিণ্ডাল। খুব দূরবর্তী মনে হয় তখন ডাঙার জীবন। যেন অনন্তকাল জাহাজটা সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে বলেই বের হয়ে পড়েছে। সামনে পেছনে, আকাশ-নক্ষত্র এবং প্রপেলারের জল ভাঙা শব্দ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

এমন জ্যোৎস্নারাতেই রাজু, বন্ধু, প্রেমা খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। এনজিন থেকে ওয়াচের লোকজন উঠে এলে ঘাবড়ে যেতে পারে। গ্যালি থেকে চা করে নিয়ে যাবার জন্য উঠে আসতেই পারে। অথবা তেষ্টা পেলে জল। দেখলে বলবে, কে? কে?

কারণ জাহাজে এই মধ্যরাতে ডেকে বেড়াবার কারও কথা নয়। তাছাড়া সব জাহাজেই নানারকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটে থাকে এমন বিশ্বাস থাকে জাহাজিদের। কারণ জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্র সফর কখন কাকে যে অবসাদগ্রস্ত করে তুলবে বলা কঠিন। অবসাদ থেকে আত্মহত্যা—আরও নানা কারণে এসব ভৌতিক ঘটনা প্রাচীন নাবিকেরা এত বেশি বিশ্বাস করে থাকে যে, তারা যেন নিজের চোখে দেখেছে এবং এভাবেই পল্লবিত হয়ে যায় সব খবর। জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রটে যায়, বরফ-ঘরে মাঝে মাঝে প্রায় বড়ো আস্ত ছাল-ছাড়ানো গোরু ভেড়ার ভিড়ে কোনো নারীর লাশ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। স্টুয়ার্ড রসদ আনবার জন্য বরফ-ঘরে কখনও একা ঢোকে না। সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে হয়। আলো নিভে গেলে রাস্তা খুঁজে উপরে ওঠাই দুঃসাধ্য।

সুতরাং এই দুই ছায়ামূর্তি প্রায় আড়ালে উঠে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড-পিকে। টুইন ডেকে উঠেই মাস্তুলের পাশে আড়াল করে দাঁড়াল তারা। এলিওয়ে ঘরে যেতে পারে না। অভিসাররা ওদিকটায় থাকে। এলিওয়েতে কার্পেট পাতা। বেশ উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ওদিক ধরে গেলে ওদের দেখে ফেলতে পারে কেউ। পরদিন সকালে সারেঙ-এর কাছে নালিশ উঠতে পারে—ওরা এত রাত্রে ডেকে কী করছিল? জাহাজে চোরাইমাল কে কীভাবে নিয়ে যায় বলা যায় না। এসব ভয়ও আছে তাদের। ফরোয়ার্ড-ডেকে এসে ওরা আরও সতর্ক হয়ে গেল। কারণ ব্রিজে সেকেন্ড মেট ওয়াচ দিচ্ছে। দেখে ফেলতে পারে। স্টাবোর্ড-সাইড ধরে গেলে দেখতে পাবে সে। যে কোনও কারণেই হোক ওদিকটায় অন্ধকার না থাকলেও নিজেদের আড়াল করার মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে।

রাজু ফিসফিস করে বলল, আরে দেবনাথ কোথায়!

সত্যি তো, দেবনাথ ফরোয়ার্ড-পিকে নেই। নোঙর ফেলবার আই-হোলের পাশে তার দাঁড়িয়ে ওয়াচ দেবার কথা।

কিন্তু চার নম্বর ফল্কা পার হতেই ওরা টের পেল, দুটো উইন্ডসহোলের মাঝখানে দেবনাথ। ওরা আরও আশ্চর্য—দেখল সামনের উইন্ডসহোলের মুখটা সে উলটো মুখে ঘুরিয়ে নিয়েছে। বাতাসের ঠিক বিপরীত দিকে। আর উইন্ডসহোলের মুখের ভিতর ঝুঁকে কী দেখছে।

কেমন আলো জ্বলছে, আলো নিভছে উইন্ডসহোলের মুখে। আলো জ্বললে আবছা মতো মুখটা ভেসে উঠছে, আলো নিভে গেলে মুখ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বেটা কী দেখছে ঝুঁকে!

ওরা হামাগুড়ি দিতে থাকল। কারণ এখন উঠে দাঁড়ালেই ব্রিজ থেকে সেকেন্ড মেট তাদের দেখে ফেলবে। নোঙর-ফেলার উইনচ ম্যাসিনের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যেতেই টের পেল, আসলে দেবনাথ ঘোরে পড়ে গেছে। ঘোরে পড়ে না গেলে এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য কেউ হয় না তারা এত কাছে, একবার রাজুর খুকখুক করে কাশি—এইরে ধরা পড়ে গেল। তোরা! বলতেই পারে। কিন্তু হুশ নেই। ওরা পেছন থেকে ঝুঁকে দাঁড়াল সন্তর্পণে আর দেখল, দেবনাথ তার অলৌকিক লাইটার জ্বালিয়ে বার বার মজা পাচ্ছে। তারা লাইটারটা দেখতে পাচ্ছে না। কারণ গোটা উইন্ডসহোলের মুখ ওর মাথা আড়াল করে রেখেছে। ডান হাতটা বাতাস থেকে লাইটারের আগুন বাঁচাবার জন্য উইন্ডসহোলের ভেতরে ঢোকানো।

ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, দেবনাথ টের পাচ্ছে না। এমনকি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও খেয়াল করছে না। না করারই কথা। জাহাজ জল ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কলকল ছলছল শব্দ আরও গভীর হতে পারে।

ওরা তিনজনই এই রহস্যকে ছুঁতে চায়।

কী আছে লাইটারে!

বার বার জ্বলছে, আবার নিভিয়ে দিচ্ছে।

যেন এক বালক খেলাচ্ছলে কাজটা করছে।

ওরা দেখছে, লাইটার জ্বললে ওর মুখ অধীর হয়ে উঠছে। মুখের সবটা দেখা যাচ্ছে না। আংশিক। ওতেও বুঝতে পারে, কিংবা মাস্তুলের আলোয় ওর মুখের অধীরতা কিংবা শরীরে আশ্চর্য ধবনি খেলা করে বেড়াচ্ছে টের পাওয়া যায়। ওদের ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে রেখেছে। উইন্ডসহোলের থেকে মুখ এবং হাত বের করে আনলেই জাপটে ধরবে। যা পাগল, ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে যদি উইন্ডসহোলের ভেতর ফেলে দেয়, তবে আজকের মতো আর লাইটারের রহস্য ধরা যাবে না। ফল্কার কাঠ না খোলা পর্যন্ত দেখা কঠিন। গুড়ো সালফার বোঝাই। উইন্ডসহোলে গলিয়ে দিলে হাজার হাজার টন ফসফেটের ভিতর থেকে লাইটারটা খুঁজে বার করাও শক্ত। কারণ তারা ধরে নিয়েছে, দেবনাথ অপ্রকৃতিস্থ। না হলে এমন আচরণ জাহাজে ভাবা যায় না। বাড়ির জন্য যে এত বিষণ্ণ হয়ে থাকত, সে-ই লাইটারটা কেনার পর আশ্চর্যরকম ভাবে পালটে গেল। শৌখিন, কেতাদুরস্ত নাবিক।

আর এ সময়ই দেখল, দেবনাথ মুখ বের করে এনে লাইটারটা ঝাঁকাচ্ছে। আসলে বোধ হয় আর জ্বলছিল না। তেল উঠে আসার পথে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে শিকারি ঈগলের মতো রাজু লাইটারটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর প্রেমা ওকে ঝাপটে ধরে রেখেছে। কারণ তারা জানে, সেও দৌড়োবে রাজুর পেছনে।

জায়গাটার একটা বিশেষ সুবিধা আছে। পাঁচ-সাতটা উইন্ডসহোলের মুখ উপরে উঠে সাপের ফণার মতো মুখ বাঁকিয়ে রেখেছে।

প্রেমা চিৎকার করতে পারছে না। দেবনাথ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে।

হইহল্লা হলে ব্রিজ থেকে সেকেন্ড মেট ছুটে আসবে। এমনকি জাহাজের সাইরেনও বেজে উঠতে পারে। ধড়ফড় করে সবাই জেগে যাবে। মধ্যরাতে সাইরেন কেন।

ফলে দেবনাথ হল্লা জুড়ে দিতে পারছে না।

কিন্তু এ কি, রাজু লাইটারটা জ্বেলে কী দেখছে। যেন তারও হুঁশ নেই।

প্রেমা দেবনাথকে ছেড়ে ছুটে গেল—এই, কী দেখছিস? রাজু ছুটতে থাকল। সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

আরে এ তো ভারি বিপজ্জনক খেলা! মধ্যরাতে স্তব্ধ আকাশের নীচে কজন নাবিকের মধ্যে মহামারি কাণ্ড। কে বিশ্বাস করবে! রাজুর হাত থেকে লাইটারটা কেড়ে নিল প্রেমা।

সেও হতবাক। কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছে।

জ্বাললে এক নগ্ন সুন্দরী নাচে। নিবিয়ে দিলে নগ্ন সুন্দরী অদৃশ্য হয়ে যায়। আগুন বাতাসে কাঁপলে নাচের বাহার একরকম, বাতাস না থাকলে সেই নগ্ন নারী সোজা মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার শরীরের সব ভাঁজ এত স্পষ্ট যে-কোনো মানুষ মুহূর্তে কামুক হয়ে উঠতে পারে। আসলে কাচের ভিতর কোনও মজা আছে অথবা আগুনের প্রতিবিম্ব কোনও মায়াবি নারীর শরীর নিয়ে ভেতরে ঘোরাফেরা করে। এখন এই আজব বাতিটা কে যে কজা করবে। এবং যখন ডেক জুড়ে এভাবে মারামারি হাতাহাতি চলছিল, তখনই ছিটকে কোথায় পড়ে গেল লাইটারটা। কাচ ভেঙে গেল।

দেবনাথ এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে দিল। সে চিৎকার করে উঠল, কেন, কেন তোরা আমার এত বড়ো সর্বনাশ করলি! আমি তোদের কী ক্ষতি করেছি? বল বল! বলে ছুটে গিয়ে সে একটা রড তুলে এনে রাজুকে খুন করতে গেলে প্রেমা ধরে ফেলল।

দেবনাথ সত্যি কেমন হয়ে গেল! সে কারও সঙ্গে আর কথা বলত না। চুপচাপ একা মধ্যরাতে ডেকে ঘুরে বেড়াত। পকেটে ভাঙা লাইটার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে নিজের সঙ্গে। তারপর এক রাতে সে আর ডেক থেকে ফিরে এল না। অজানা সমুদ্রে সে হারিয়ে গেল।